অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুলক দত্ত

১৯৭১ সাল নাগাদ একটি বিশেষ সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিতে বিষ্ণুপুরে জড়ো হয়েছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার এক ঝাঁক শিল্পী। বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত সেই সম্মেলনে আরো অনেকের গান-বাজনার সঙ্গে বিষ্ণুপুরবাসী সেদিন শুনেছিলেন অশেষচন্দ্রর এস্রাজ বাদন। সম্মেলন শেষ হবার পরদিন রাত্রিবেলা, গোস্বামী[১] আর বন্দ্যোপাধ্যায়[২] পরিবারকে দুই প্রান্তে ধারণ করে রাখা শাঁখারী বাজারের দুর্গা মন্দির সংলগ্ন বাড়ির বারান্দায় বসে গান-বাজনার আসর। সামনের রাস্তা আর উল্টোদিকের বাড়ির বারান্দায় বসে সেদিনের আসর উপভোগ করেন প্রধানত শাঁখারী বাজারের বাসিন্দারা। পরদিন সকালে চায়ের দোকানে মুড়ি-ঝালবড়া, চা আর সিগারেটের সঙ্গে জমেছিল গতকালের অনুষ্ঠান নিয়ে আড্ডা। শিল্পী ও শ্রোতাদের প্রাণবন্ত সেই আড্ডায় যেমন একেকজনের গান-বাজনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলেছিল আলোচনা তেমনই তা জমে উঠেছিল বিষ্ণুপুরি রসিকমনের ঠাট্টা রসিকতা আর ফাজলামিতে। ... যাঁর শতবর্ষ উপলক্ষে সেদিন বিষ্ণুপুর ডুবেছিল এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রসে, এই বছর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মশতবর্ষ।

এরই কাছাকাছি সময় ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তন রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতার বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে আয়োজন করে এক সঙ্গীত সম্মেলনের ; কলকাতার মানুষ অশেষচন্দ্রর বাজনা শোনার সুযোগ পান এই আসরে।

এর বছর দশেক আগে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলনে অশেষচন্দ্র এস্রাজ পরিবেশন করেন ; রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত

---

[১] জগৎচাঁদ-রাধিকাপ্রসাদ-জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ইত্যাদি।

[২] অনন্তলাল-রামপ্রসন্ন-গোপেশ্বর ইত্যাদি।

একটি ফোটোগ্রাফে ধরা আছে সেই স্মৃতি। শান্তিনিকেতনের গণস্মৃতিতে এই তথ্যটুকু আজও টিকে আছে যদিও সেই পরিবেশনের সাঙ্গীতিক রূপ ও বিশিষ্ট বাদনশৈলীর স্মৃতি উজ্জ্বল থাকেনি বেশিদিন। অল্প কয়েকজন মানুষই সেদিনের সাঙ্গীতিক স্মৃতি আজও ধারণ করে আছেন ; তৎকালীন সঙ্গীত ভবনের ছাত্র ও প্রাক্তন অধ্যাপক সীতাংশু রায় জানিয়েছেন সেই সম্মেলনে সকালবেলা অনুষ্ঠান হত রবীন্দ্রসঙ্গীতের। শান্তিনিকেতন ও বাইরের প্রত্যেক শিল্পীদের সঙ্গে এস্রাজ সঙ্গত করতেন অশেষচন্দ্র। সন্ধ্যায় বসত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর। সেখানেই এক সন্ধ্যায় অশেষচন্দ্র তাঁর একক এস্রাজ বাদন পরিবেশন করেন। তাঁর সঙ্গে তবলা বাজান অনাদিনাথ দত্ত, তানপুরায় বীরেন্দ্রনাথ পালিত ও এস্রাজে তাঁর শিষ্য ১৮ বছর বয়সী রণধীর রায়। বেহাগ রাগে আলাপ-জোড়-ঝালা, মসীতখানি-রেজাখানি গৎ হয়ে ঝালা বাজিয়ে শেষ হয় তাঁর প্রথম উপস্থাপনা। তারপর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসরে লঘু চালে ঠুংরী বা ধুন বাজানোর যে-রীতি আছে সেই অংশে অশেষচন্দ্র বাজিয়ে শোনান রবীন্দ্রনাথের গান, 'ফাগুন, হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান ...।'[৩]

রণধীর রায় জানিয়েছেন ১৯৫১-৫২ সালে রথীন্দ্রনাথের আয়োজনে উত্তরায়ণের উদয়ন বাড়িতে দু'বার অশেষচন্দ্রর পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। ১৯৫০ সালে অশেষচন্দ্রর বিষ্ণুপুরবাসী সহকর্মী যখন বিয়ে করে বউ নিয়ে শান্তিনিকেতন পৌঁছোন তখন অশেষচন্দ্রর নির্দেশে অন্য কোনো থাকার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সেই নবদম্পতি কিছুদিন তাঁর পরিবারের সঙ্গেই থাকেন। ১৭-১৮ বছর বয়সের সেই নববধূর[৪] শান্তিনিকেতন জীবনের প্রথম কয়েকটি ভোর কাটে অশেষচন্দ্রর সেতারের রেওয়াজ শুনে। সেই সময় অশেষচন্দ্র নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করতেন রেডিওতে। শোনা যায় এক বগলে সেতার আর অন্যটিতে এস্রাজ নিয়ে কলকাতা যেতেন রেডিও রেকর্ডিং-এর জন্য ; সেই বাজনা যেদিন রেডিওতে শোনানো হত, সেদিন পিয়ার্সন

---

[৩] সীতাংশু রায়, 'স্মৃতিচারণ', *In Memory of Ashesh Bandyopadhyay*, Nabanna Earth Weekend Festival. Gitanjali complex, Bolpur. 01 March 2020.

[৪] গীতা দত্ত (অনাদিনাথ দত্তর স্ত্রী), বছর দেড়েক আগে মৃত্যুর আগে অবধি অন্যদের এই গল্প শোনাতে তিনি ভালোবাসতেন।

মেমোরিয়াল হাসপাতালের রেডিওতে সেই বাজনা শোনার জন্য ভিড় করতেন শান্তিনিকেতনের বাসিন্দারা।

শান্তিনিকেতন

বিষ্ণুপুরের শাঁখারী বাজারে ১৯২০ সালে অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে মাতৃহারা অশেষচন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষা শুরু করেন পিতা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। নয় বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গীতে পিতার তালিমের অবসান ঘটে। এরপর প্রায় তিন বছর মাঝে মাঝেই ম্যালেরিয়ায় ভুগতে থাকায় ব্যাহত হয় অশেষচন্দ্রর সঙ্গীতিক তালিম। কলকাতায় দুই কাকা গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তাঁর তালিম চলতে থাকে বারো বছর বয়স থেকে। টানা চার-পাঁচ বছর কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের ধারাবাহিক তালিমে অশেষচন্দ্র নিজেকে গড়ে তুলতে থাকেন একজন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে।

১৭ বছর বয়সে শান্তিনিকেতন আসার পর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে আর কখনো ধারাবাহিক তালিমের সুযোগ পান নি তিনি। শান্তিনিকেতনের সাঙ্গীতিক পরিবেশে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার পরিসরটি ছিল সঙ্কীর্ণ ; অশেষচন্দ্রর সঙ্গীতজীবনের প্রধান সময়টি তাই কেটেছে রবীন্দ্রনাথের গান বাজিয়ে আর শান্তিনিকেতনের উপাসনা-উৎসব-অনুষ্ঠানের আবহ-সঙ্গীত রচনায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে সুরের যন্ত্রীদের নিজস্ব সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের অবকাশ প্রায় নেই ; রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েদের মতন রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর রচনার যথার্থ প্রকাশ ঘটানোই তাঁদের কাজ। অন্যদিকে আনদ্ধ যন্ত্রশিল্পীরা সীমিত ভাবে পেয়ে থাকেন এই অবকাশ ; যন্ত্র নির্বাচন, গানের মধ্যেই বিভিন্ন ছন্দ পরিবর্তনের সাঙ্গীতিক প্রয়োগ আর তেহাই রচনার বিরাট জগতের মধ্যে তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিশীল সত্তা সক্রিয় রাখতে পারেন। এই জগতে রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রসঙ্গীত-রবীন্দ্রনাট্য বিশেষজ্ঞের নির্দেশ-উপদেশ থেকে তাঁরা মুক্ত। অশেষচন্দ্র বঞ্চিত হন সৃজনলীলার এই আনন্দ থেকে। গাইয়েদের পিছনে বসে রবীন্দ্রসৃষ্ট স্বরবিন্যাস এস্রাজে যথাযথভাবে বাজানোর বাইরে যে-কয়েক মিনিট সময় পেতেন, তাকেই তাঁর সৃজনে তিনি ভরে তুলতেন। অনুষ্ঠান শুরু ও দুটি

গানের মধ্যবর্তী সময় জ্যান্ত হয়ে উঠত প্রাসঙ্গিক স্বরবিন্যাসের আলাপে ; এমনকী উপাসনা গৃহের ঘণ্টাধ্বনি, সেই আওয়াজের টোন, রেশ আর গতিকেও করে নিতেন তাঁর সৃজনের অঙ্গ। আর কী সংযত সুরের ব্যবহার! এই সময়টিকে তিনি কখনো তাঁর দুই হাতের সার্কাস দেখানোর বেদি হিসেবে ব্যবহার করেন নি। তাঁর কাছ থেকে এইটিই হয়ত ছিল বিশ্বভারতীর প্রত্যাশা। বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবন যখন শেষ বয়সে অশেষচন্দ্রর বাজনা রেকর্ড করার উদ্যোগ নেয়, সেখানে তাই তাঁর এস্রাজ বাদনের রেকর্ডিং-এ স্থান পায় কেবলমাত্র তেরোটি রবীন্দ্রসঙ্গীত।[৫]

শান্তিনিকেতনে চলে আসায় যেমন তার তালিম থেকে যায় অসম্পূর্ণ তেমনই উপযুক্ত সাঙ্গীতিক পরিসরের অভাবে তাঁর সঙ্গীত পূর্ণ বিকাশের সুযোগ থেকে হয় বঞ্চিত।

বিষ্ণুপুর

ষোড়শ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর অথবা মল্লভূমের রাজা বীর হাম্বির শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[৬] বিষ্ণুপুরের জনজীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব এখানকার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি চর্চায় কত গভীর। অলঙ্কারের আতিশয্য ও অতিনাটকীয়তার মুদ্রাদোষ থেকে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতকে মুক্ত রেখেছিল বৈষ্ণব ধর্মের এই বিশিষ্ট যাপন। শ্রীচৈতন্যর ভক্তি আন্দোলনের সাঙ্গীতিক প্রকাশ বাংলা কীর্তনের গণমুখী চরিত্র বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-সংস্কৃতি চর্চার একটি বিশেষ লক্ষণ। এই সূত্রেই সঙ্গীতের উঁচু-নীচু, গ্রামীণ-নাগরিক, লোক-শাস্ত্রীয় ভেদাভেদ এই চর্চায় অস্পষ্ট। অশেষচন্দ্রকে যাঁরা মনোযোগ দিয়ে শোনার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা জানেন, টুসু থেকে টপ্পা, ধ্রুপদ থেকে ভাদু অথবা কীর্তন থেকে খেয়াল, কী অনায়াস ছিল তাঁর যাতায়াত। গরাণহাটী ও মনোহরশাহী, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়

[৫] ১। এ ভারতে রাখো নিত্য ২। আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে ৩। জয় তব বিচিত্র আনন্দ ৪। বিপুল তরঙ্গ রে ৫। প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন ৬। সুধাসাগরতীরে হে ৭। প্রভাতে বিমল আনন্দে ৮। শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে ৯। হে সখা, মম হৃদয়ে রহো ১০। বাজাও তুমি কবি ১১। চরণধ্বনি শুনি তব, নাথ ১২। আজি এ আনন্দসন্ধ্যা ১৩। এ পরবাসে রবে কে হায়

[৬] বীর হাম্বিরের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৫৬৫ থেকে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ।

ভাগে উদ্ভূত বাংলা কীর্তনের এই দুটি রূপের সঙ্গেই শ্রীনিবাস আচার্যের যোগ ছিল গভীর। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর - এই চারটি রস পদাবলী ও লীলাকীর্তনের অলঙ্কার। এদের মধ্যে মধুর, উজ্জ্বল অথবা শৃঙ্গার সর্বশ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চায় তাই প্রধান রসের গুরুত্ব পেয়ে যায় মাধুর্য। ১৯২৫ সালে লখনউ শহরে চতুর্থ অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সের আলোচনা সভায় দুটি রাগের রূপ নিয়ে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। গোপেশ্বরের মতে দেবগিরি রাগটি কামোদ এবং ঝিঁঝিট রাগের সমন্বয়ে সৃষ্ট, রাধিকাপ্রসাদ অসম্মতি জানান, বলেন এ রাগে বিলাবল ও শুদ্ধ কল্যাণের পরিষ্কার ছায়া পাওয়া যায় ; গোপেশ্বর বলেন লচ্ছশাখ হল বেহাগ ও কামোদ রাগের সমন্বয়, রাধিকাপ্রসাদের মতে এটি কামোদ ও বিলাবল রাগের যোগফল।[৭] একই ঘরানার দুই শিল্পী নির্দিষ্ট রাগরূপ নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করায় অনেকে বিষ্ণুপুরকে ঘরানা বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। 'ঘরানা'-র তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, বিষ্ণুপুরের ক্ষেত্রে মাধুর্যের প্রাধান্যই একই ঘরানার এই দুই বিশিষ্ট শিল্পীকে সামঞ্জস্যে বেঁধে রেখেছিল। অশেষচন্দ্রর সঙ্গীতও এই মাধুর্যবোধ থেকে উৎসারিত।

পাশাপাশি পাখোয়াজের যে-তিনটি বাদনশৈলী মিলিত হয়েছিল বিষ্ণুপুরে, তারাও গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ-প্রভাবিত সঙ্গীত চর্চায় একত্রে নির্মাণ করেছিল এক যৌথ পরিচিতি। দিল্লি ঘরানার পীরবক্স খাঁ অষ্টাদশ শতকে কলকাতার জমিদার হরকুমার ঠাকুরের বাড়িতে ছিলেন, বিষ্ণুপুরের রামমোহন চক্রবর্তী তাঁর কাছে পাখোয়াজ শিক্ষা করেন। এই বাদনশৈলীর শেষ বাদক নিত্যানন্দ গোস্বামী ১৯৭১ সালে মারা যান। মথুরা গিয়ে লালা হীরালালজির কাছে পাখোয়াজ শিক্ষা করেন বিষ্ণুপুরের বেচারাম চট্টোপাধ্যায় - এই ধারাটির শেষ শিল্পী সুবোধ নন্দীর মৃত্যু ১৯৭০ সালে। অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত তৃতীয় ধারাটির শেষ শিল্পী ছিলেন অনাদিনাথ দত্ত, ২০০২ সালে তাঁর প্রয়াণে এই শেষ বাদনশৈলীটির সমাপ্তি ঘটে।[৮] এই সঙ্গীতচর্চা 'ঘরানা'-র প্রচলিত সংজ্ঞা পূরণ না করলেও বাঙালির নিজস্ব এক সঙ্গীতজগৎ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। বিষ্ণুপুর

---

[৭] কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *কুদরত্ রঙ্গিবিরঙ্গী*, আনন্দ, কলকাতা, ১৪০১ (১৯৯৪)। পৃ. ২৬১

[৮] অলোক দত্ত, 'বিষ্ণুপুরের পাক্কা আওয়াজ' *শারদীয়া নবপত্রিকা*, ১৪১৮ (২০১১) কলকাতা। পৃ. ১২০-১২২ দ্রষ্টব্য।

ঘরানা নামে পরিচিত সঙ্গীতচর্চায় অন্যান্য ঘরানার চল যখন এসে মিশেছে, তাকে মধুর রসেই ডুবিয়ে নিয়েছেন এখানকার শিল্পীরা - এইটিই এই ঘরানার পেশাদার-অপেশাদার সমস্ত সঙ্গীতশিল্পীর বৈশিষ্ট্য।

শিল্পীরা একই সঙ্গে সঙ্গীতের শ্রোতা-গুরু-গবেষক, যিনি শ্রোতা তিনিই স্রষ্টা অথবা চা-ঝালবড়া দোকানের দোকানি সন্ধ্যায় কীর্তন গাইয়ে - অন্যান্য অনেক জায়গার মত বিষ্ণুপুরের সাঙ্গীতিক পরিবেশে এইটি একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

অশেষচন্দ্রর সঙ্গীত : রসাস্বাদন ও বিশ্লেষণ

১৯৬০-এর দশক থেকে জন্মানো শান্তিনিকেতনবাসীরা অশেষচন্দ্রর একক এস্রাজ বাদন শোনার তেমন কোনো সুযোগ পাননি। কেবলমাত্র ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তনের উদ্যোগে প্রকাশিত তাঁর দুটি রেকর্ড শুনেই তাঁর বাজনা সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা। ১৯৭৮ সালে ই এম আই থেকে প্রকাশিত হয় অশেষচন্দ্রর একমাত্র লং প্লেয়িং রেকর্ড। কলামন্দির বেসমেন্টে এক সন্ধ্যায় তার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠানে অশেষচন্দ্র এস্রাজে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এর পর ক্যাসেটে প্রকাশিত হয় তাঁর আরেকটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্টুডিও রেকর্ডিং। সম্ভবত ১৯৮০ সালে কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে অশেষচন্দ্র ও ভি ভি ওয়াজালওয়ারের একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তন। সেই সভায় অশেষচন্দ্র এতটাই 'আপ্লুত' হন যে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। কথা আর বলতে পারেন নি তবে সেদিন সকালে কলকাতার মানুষ শুনেছিলেন অশেষচন্দ্রর একক এস্রাজ বাদন। এইটিই সম্ভবত তাঁর শেষ পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান।

এর বাইরে তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলার জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো রেকর্ডিং বা আলোচনা প্রায় চোখে পড়ে না। কেমন করে তিনি এই বিশেষ যন্ত্রটিকে একক বাদনের উপযুক্ত করে তুললেন, তাঁর দীর্ঘ দিনের সঙ্গীত সাধনায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা, তাঁর সঙ্গীতে সেতার ও এস্রাজে রাগরূপ ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পেত কিনা ইত্যাদি আলোচনা খুব কমই শুনতে

পাওয়া যায়। অন্যদিকে, তাঁর সঙ্গীত নিয়ে সবথেকে বেশি যে-আলোচনাগুলি আমরা পেয়ে থাকি সেখানে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা হয় আবহসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত 'শিল্পী' হিসেবে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত 'স্রষ্টা' হিসেবে নয় ; এই ধরনের আলোচনায় তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক ও আবহসঙ্গীত রচনাকারদের সঙ্গে তুলনীয় - তাঁর সমসাময়িক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতস্রষ্টাদের সঙ্গে নয়।

সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন ১৯৪০-এর দশকের গোড়ায় ; তাঁর শান্তিনিকেতনবাসের স্মৃতির একটি বড় জায়গা নিয়ে আছে অশেষচন্দ্রর বাজনা। ই এম আই থেকে প্রকাশিত রেকর্ডের পিছনের প্রচ্ছদে অশেষচন্দ্রর সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, 'When I heard him in Santiniketan, Ashesh Bandopadhyaya was not much in evidence as a soloist, but he was always on hand to provide the accompaniment to recitals of Rabindrasangeet. Such was his command of the insrument, and so deep and true his feeling for the songs, that one often found oneself listening to the instrument rather than the singer.' লিখলেন, 'The present record, Ashesh Bandopadhyaya's first solo contribution to the gramophone, perpetuates his art of playing classical ragas on the esraj.'[৯] এর বাইরে বাকি লেখাটি ভরা আছে এস্রাজ ও অশেষচন্দ্রর বংশতালিকা ও তথ্য-ইতিহাসে। যে-জৌনপুরি, বেহাগ ও ধুন শুনবার জন্য মানুষ খরচা করে এই রেকর্ডটি কিনবেন, অশেষচন্দ্রর হাতে এস্রাজে তার যে-রূপটির পরিচয় তাঁরা পাবেন বাজনা শুনে, তার সাঙ্গীতিক প্রেক্ষিত রচনার কোনো প্রয়াস এই 'পরিচিতি'তে নাই। যদিও এই পরিচিতি লেখার যোগ্য লোকের অভাব ছিল না তবুও 'বাণিজ্যিক' কারণে প্রয়োজন ছিল সত্যজিতের লেখা ও তাঁকে দিয়ে রেকর্ড প্রকাশ করানো। ফলও পাওয়া গিয়েছিল, ই এম আই রেকর্ড প্রকাশ করতে রাজি হওয়ার পেছনে হয়ত একটা বড়ো কারণ সত্যজিতের সুপারিশ। একই সঙ্গে ঘটে আরেকটি ঘটনা : সত্যজিতের যে-গুরুত্বের কারণে রেকর্ড প্রকাশ সম্ভব হয়, সাক্ষর বাঙালি মননে তাঁর

[৯] Satyajit Ray, 'Liner note', *Ashesh Bandopadhyaya, Tabla: Ustad Keramatullah Khan, Raga Jaunpuri, Behag, Dhun.* EMI, LP 1978.

সেই কর্তৃত্বের প্রভাবেই ‘অশেষচন্দ্র একজন অসাধারণ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী’ ভাবটি জোরালো হয়ে ওঠে।

আরেকটি নমুনা দেখা যাক। অশেষচন্দ্রর রেকর্ড প্রকাশ, শহরে তাঁর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, কলকাতায় তাঁর একক বাদনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা ইত্যাদির সঙ্গে যাঁর নামটি মিশে আছে সেই সুভাষ চৌধুরী অশেষচন্দ্র কত বড়ো মাপের সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন সেইটি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবহার করেছেন চারজন তবলাবাদকের প্রতিক্রিয়া। সুভাষের ছাত্রাবস্থায় বারাণসীতে একটি অনুষ্ঠানে অশেষচন্দ্র এস্রাজ পরিবেশন করেন, ‘অশেষদা এস্রাজ হাতে তুলে নিতেই তবলাবাদকের মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব অশেষদারও চোখ এড়াল না। ... প্রথমেই ধরলেন মধ্যলয়ে গৎ। পরে দ্রুত লয়ের গৎ ধরতেই তবলাবাদক গায়ের কোট খুলে ফেললেন। অশেষদা যখন থামলেন তবলাবাদক বিধ্বস্ত।[১০] কোন রকমে কোট আর টুপি নিয়ে চলে গেলেন।’ সুভাষ ও আরো অনেকে এই ঘটনা থেকে অশেষচন্দ্রর সাঙ্গীতিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে তুলতে পারলেও সঙ্গীতানুরাগী সাধারণ মানুষের কাছে এই গপ্পোটির কোনো সাঙ্গীতিক মূল্য থাকতে পারে না। সঙ্গীতসৃষ্টি তো একটি শারীরিক ক্রিয়া, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে কোট-চাদর খুলে ফেলা অথবা বিরতির সময় পোষাক বদলের রেওয়াজ তো নতুন কিছু নয়! ... সম্ভবত ১৯৭৭ সালের ঘটনা, স্টুডিওতে করামতুল্লা-অশেষচন্দ্রর রেকর্ডিং শেষে শোনা হচ্ছে সেই বাজনা। ‘অশেষদা নিজের জায়গায় বসে আর করামৎ খাঁ সাহেব হাত দুটি পিছনে দিয়ে ঘুরছেন, যখন সমে এসে পড়ছেন তখনই অশেষদার সামনে এসে মাথাটা নামিয়ে যেন সলাম জানাচ্ছেন।’ করামতুল্লা খাঁ একজন প্রতিষ্ঠিত ঘরানাদার শিল্পী, প্রশ্নাতীত তাঁর সৃষ্টিশীলতার গভীরতা, সেই তিনি ‘যেন’ সলাম জানাচ্ছেন - আগ্রহী শ্রোতারা এখানেও সাঙ্গীতিক আলোচনা থেকে হলেন বঞ্চিত। সেই রেকর্ড প্রকাশ-অনুষ্ঠানে অশেষচন্দ্রর সঙ্গে তবলা বাজান স্বপন চৌধুরী, ‘তিনি বাজালেন যেন অনুগ্রহ করছেন, অশেষদাকে জাতে তুলছেন এই মনোভাব নিয়ে।’ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আরো অনেকের কিন্তু এমনটা মনে হয় নি। অনুষ্ঠানের

[১০] তবলিয়া ও যন্ত্রীরা একে অপরকে ‘বিধ্বস্ত’ করতে সবচেয়ে প্রচলিত যে-দুটি পথ ব্যবহার করেন তার একটি হল সূক্ষ্ম ও জটিল লয়ের চলন আর অন্যটি লয়ের দ্রুততা। অশেষচন্দ্র কী ভাবে এই অপরিচিত তবলিয়াকে বিধ্বস্ত করলেন সেইটির উল্লেখ ছাড়া রসিক শ্রোতারা তাঁর সঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করবেন কী ভাবে?

পর একদল সঙ্গীতশিল্পীর আলোচনায় এই প্রশ্নই উঠে এসেছিল : তবলিয়া নির্বাচন কে করলেন? এঁদের দু'জনের লয়ের চিন্তা, যন্ত্রের আওয়াজের নিকাশ, সঙ্গীতবোধ এতই ভিন্ন যে কেবলমাত্র সঙ্গীত-কানা কোনো বেরসিকই ভাবতে পারেন এমন একটি জুড়ির কথা! ... কলকাতায় অশেষচন্দ্রর শেষ অনুষ্ঠান, তবলায় শ্যামল বসু, '... অশেষদা বাজালেন আহির ভৈরোঁ। সকলের অনুরোধে সব শেষে বাজালেন রবীন্দ্রনাথের 'যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার'[১১] গানটি। ... সবচেয়ে চমৎকৃতিজনক অভিজ্ঞতা হল যখন শ্যামল বসু গানের সঙ্গে প্রথম ছত্রটি বাজানোর পর হঠাৎই থেমে গেলেন। অনুষ্ঠান শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'দূর মশাই, এ সব গানের সঙ্গে বাজানো যায় নাকি। শুনতে হয়।' সেই অভিজ্ঞতা থেকে আজ বুঝি তাঁর বক্তব্য ছিল কতখানি সত্য।'[১২] অথচ এস্রাজে আহির ভৈরোঁর পূর্ণাঙ্গ একটি পরিবেশনের সঙ্গে শ্যামল বসুর বাজাতে কোনো অসুবিধা হল না। সাধারণ শ্রোতার কাছে এর অর্থ দাঁড়ায় এই রকম, 'দূর মশাই, এ-বাজনা তো আমাদের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাথমিক রূপ - শোনবার দরকারই হয় না, অন্য কথা ভাবতে ভাবতেও অনায়াসে বাজিয়ে দেওয়া যায়।' এই গল্পেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল এই অভিমত : রসস্রষ্টা হিসেবে অশেষচন্দ্র তাৎপর্যহীন ; তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ও কৃতিত্ব প্রচলিত বাঙলা-হিন্দি গান, টপ্পা ও বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীত এস্রাজে বাজানোয়।

১৯৭১ সাল নাগাদ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় শতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতায় যে-সঙ্গীত সম্মেলন আয়োজিত হয়, সুভাষ চৌধুরী ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। শান্তিনিকেতন থেকে অশেষচন্দ্র-সহ আরো কয়েকজন বিষ্ণুপুরের শিল্পী আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য। সেই অনুষ্ঠানে কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে তবলা ও পাখোয়াজ বাজান বিষ্ণুপুরের তবলিয়া ও পাখোয়াজিরা - অশেষচন্দ্রর একক এস্রাজ বাদনের সঙ্গেও বেজেছিল তবলা। এই অনুষ্ঠানের উল্লেখ সুভাষ চৌধুরীর এই লেখায় অনুপস্থিত - সচেতন এই নীরবতার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আগ্রহী সাধারণ শ্রোতার পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

---

[১১] ঝাঁপতালে রচিত মূল হিন্দি গান *বিন নহী দেখেঁ*। অশেষচন্দ্রর এস্রাজে মূল গানটির সাঙ্গীতিক রস প্রাধান্য পেত না রূপান্তরিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাব প্রকাশ পেত তা খুব স্পষ্ট করে বলা যায় না।

[১২] সুভাষ চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথের গান ও অন্যান্য*, প্রতিভাস, কলকাতা। পৃ. ১৬-১৮

১৯৯২ সালে অশেষচন্দ্রর সংবর্ধনা উপলক্ষে সঙ্গীতভবন ছাত্র সম্মিলনীর পক্ষ থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।[১৩] মূলত স্মৃতিচারণ ভিত্তিক এই সংকলনে সাঙ্গীতিক বিশ্লেষণ প্রত্যাশিত নয়। তবে এই সংকলনে প্রকাশ পায় অশেষচন্দ্রর শিষ্য প্রয়াত রণধীর রায়ের '১৯৮৮ সালে বি. বি. সি. র জন্য রেকর্ড করা বক্তব্যের সম্পাদিত অনুলেখন।' রণধীরের এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আলোচিত হয় অশেষচন্দ্রর সঙ্গীতের প্রায় প্রতিটি উপাদান। তাঁর রাগ ও তাল-চিন্তার গভীরতা, সেতারে এস্রাজ অথবা এস্রাজে সেতার বাজানোর নির্বোধ চর্চার বদলে দুটি যন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার ও তার যথাযথ সাঙ্গীতিক প্রয়োগ, সঙ্গীতসৃষ্টির মৌলিক কাঠামোগত পদ্ধতির জ্ঞান, সঙ্গীতে পরিমিতি ও সংযমবোধের গুরুত্ব ; যন্ত্র ধরবার আসন, ছড় ধরার মুদ্রা ও ব্যবহার, ডান হাত দিয়ে ঝালায় বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বাজানোর প্রথা, বাণীর স্পষ্ট উচ্চারণ ইত্যাদি সব কটি স্তর ছুঁয়ে আছে এই লেখা। পাশাপাশি রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের আদর্শস্থানীয় আবহ রচনায় অশেষচন্দ্রর অবদানের কথাও তিনি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন। রণধীর সঙ্গীতভবনে এস্রাজ শিক্ষা করেন নি, অশেষচন্দ্রর তালিম পেয়েছেন গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গুরুগৃহে। 'শিল্পী নিজে কী করে বড় হয়ে উঠবে, শিল্পী নিজে কী করে সঙ্গীত পরিবেশন করবে, ছাত্র কোন পথ ধরে সঙ্গীত শিক্ষা করলে পরবর্তীকালে সে নিজের সঙ্গীত পরিবেশন করে উঠতে পারবে' এই একটি বিশেষ তালিম রণধীর পেয়েছিলেন অশেষচন্দ্রর কাছে এবং তাঁর অন্যান্য গুরুদের কাছে নয় - 'কী করে সঙ্গীত সৃষ্টি করতে হয়, কী করে খানিক্ষণ সময় সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে যেতে হয়, এই বিশেষ পথটি আমার জীবনে বিষ্ণুপুর ঘরাণার অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই পাওয়া।'[১৪] এমন লেখার অভাবেই হয়ত যে-এস্রাজে অশেষচন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন একক বাদনের এই শৈলী, তার স্থান আজ গায়কের পিছনে। গানের স্বরবিন্যাসকে আক্ষরিক অর্থেই 'ফলো' করা, মানে পিছনে পিছনে চলাই আজ তার একমাত্র কাজ। এই ছোটো যন্ত্রে এস্রাজের একক পরিবেশন আজ আর প্রায় শোনাই যায় না। কোনো যোগ্য সঙ্গীত-গবেষক রণধীরের এই লেখাটি ভিত্তি করেই গড়ে তুলতে

---

[১৩] অশোককুমার সান্যাল [সম্পাঃ], *সুরের ভুবনে (বিশেষ সংখ্যা)*, বৈশাখ ১৩৯৯ [১৯৯২], শান্তিনিকেতন।

[১৪] রণধীর রায়, 'শিল্পী ও শিক্ষক অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে', অশোককুমার সান্যাল [সম্পাঃ], *সুরের ভুবনে (বিশেষ সংখ্যা)*, বৈশাখ ১৩৯৯ [১৯৯২], শান্তিনিকেতন। পৃ. [সাত]

পারেন অশেষচন্দ্রর সঙ্গীতের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। তিনি কী হয়েছিলেন সেইটির আলোচনা যেমন জরুরি তেমনই গুরুত্বপূর্ণ তিনি কী হতে পারতেন তার বিস্তারিত সাঙ্গীতিক বিশ্লেষণ। এই সূত্রেই এস্রাজের, সুরেন্দ্রনাথ থেকে অশেষচন্দ্রে উত্তীর্ণ হবার ইতিহাসটিও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা দাবী করে।

In Memory of Ashesh Bandyopadhyay, Nabanna Earth Weekend Festival উপলক্ষে আয়োজিত সভায় পঠিত বক্তব্যের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। ০১ মার্চ ২০২০, গীতাঞ্জলি প্রাঙ্গণ, বোলপুর।

কৃতজ্ঞতা : শ্রীরমিত রায়, শ্রীমতী রতি বসু।